# বাংলা ও অসমীয়া লোককথা : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

তপতী সাহা

"বাইরে কেবল জলের শব্দ ঝু-প্ ঝু-প্ ঝুপ
দস্যি ছেলে গল্প শোনে, একেবারে চুপ।"[১]

গল্প বলা এবং গল্প শোনার প্রবৃত্তি মানুষের চিরন্তন। আদিম গুহামানব শিকারের শেষে অবসরে বসে যে চিত্র আঁকত তা ও তো এক গল্প। ভাষা, লিপি সৃষ্টির আগে রঙে, রেখায় চিত্রিত এক নিটোল গল্প। এই চিরন্তন প্রবৃত্তি থেকেই রূপকতা বা লোককথার সৃষ্টি। যুগ যুগ ধরে মানুষের মুখে বলে আসা শ্রুতিবাহিত এই গল্প দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে চলে যায় সময় থেকে সময়ান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে।

মুখ্যত মৌখিক কথায় আশ্রয়েই গড়ে ওঠে লোক কথার অলৌকিক জগৎ। লোককথা বা লোক জীবনের এক সর্বকালীন চরিত্র আছে। দেশকাল পাত্র ভেদে হয়তো সামান্য কিছু পার্থক্য বা পরিবর্তন লক্ষিত, এক কথক থেকে অন্য কথকে পৌঁছতে সাংস্কৃতিক কিছু পার্থক্যও হয়তো লক্ষ্য করা যায় কিন্তু ভেতরের উপাদান বা মর্ম কথা প্রায়শই একই থেকে যায়। মহেশ্বর নেওগের কথায় ও এরই সমর্থন পাওয়া যা। "অনেক বোৰ সাধু সময় বা স্থনৰ বহুত ব্যবধান সত্ত্বে গড়ত প্রায় একে হোবা দেখা যায়।"[২] (অনেক রূপকথাই সময় বা স্থানে অনেক ব্যবধান সত্ত্বেও প্রায়ই একই রকম দেখা যায়)। তাই কন্নড় ভাষায় লেখা রাতকানা জামাইয়ের গল্পের সঙ্গে অসমীয়া ভাষার 'জোঁরাইৰ সাধু' (জামাইয়ের গল্প) গল্পটি মিলে যায়।, অথবা মারাটী 'মা-ছেলের বিয়ে'র প্রসঙ্গে গ্রীক অয়দিপাউসের কথা বা গুজরাতি 'সাপিনী মা'—এর সঙ্গে অসমীয়া 'চিলনীৰ জিয়েকৰ সাধু'র (চিলনী মেয়ের গল্প) কথা মনে হয়।

দেশকাল-সংস্কৃতির জন্য সামান্য ভিন্নতা ছাড়া প্রায় সমস্ত লোককথাই যে একই ধরনের তারই সাক্ষ্য বহন করে বাংলা ভাষায় দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সম্পাদিত 'ঠাকুরমার ঝুলি' এবং অসমীয়া ভাষায় লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া। সম্পাদিত 'রুঢ়ী আইৰ সাধু'।

১৯০৭ সালে দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি'র সংকলন প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ভট্টাচার্য এ্যান্ড সন্স, ভূমিকা লেখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'বুঢ়ী আইর সাধু'র সংকলক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া। প্রকাশিত সন ১৯১১। ভূমিকা লেখেন সংকলক নিজে। দক্ষিণারঞ্জনের ক্ষেত্রে এই রূপকথার সংকলনের মূল প্রেরণাদাত্রী তার মা। লেখকের নিজের কথায় "মা আমার অফুরণ রূপকথা বলিতেন। মার মুখের অমৃত

সাহা, তপতী : বাংলা ও অসমীয়া লোককথা : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ
*International Journal of Bengal Studies, Vol. : 2-3, 2011-2012, PP 176-182*



কথার শুধু রেশগুলি মনে ভাসিত"[৩] লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াও শৈশবে রূপকথা শুনতেন। জীবন স্মৃতিতে তিনি জানাচ্ছেন যে তার রূপকথার ভাণ্ডার ছিল তাঁর দূরসম্পর্কীয় এক দাদু। সন্ধ্যেবেলায় তার কাছে বসে রাজা প্রজা ভূত প্রেত প্রভৃতির গল্প শুনতেন, একই সঙ্গে ভয়ও পেতেন আবার মজাও পেতেন।[৪]

যে দু'জন লেখকের সংগৃহীত রচনা এই আলোচনায় গৃহীত হয়েছে তাঁদের মধ্যে একজন বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি, বাংলার লোকজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত; অন্যজন অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যেও 'মুকুটহীন সম্রাট' এবং বাংলা সাহিত্যের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। বৈবাহিক সূত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত। হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয়া কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। এছাড়া উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য কলকাতায় এসে অন্য আরও অনেক অসমীয়া যুবকের মতো এই লেখকও বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হন। তবে তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন নিজ মাতৃভাষা অসমীয়ায়। উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, সাহিত্যের প্রায় সমস্ত শাখায় অবাধ বিচরণকারী এই লেখক অসমীয়া শিশুসাহিত্য ও লোক সাহিত্যের অঙ্গনেও বিশেষ অবদানের অধিকারী। এই ধরেনর রচনাগুলির মধ্যে 'ককাদেউতা আৰু নাতি লবা', 'বুঢ়ী আইৰ সাধু', 'জুনুকা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা ও অসমীয়া ভাষায় অজস্র লোককথার সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু আলোচ্য নিবন্ধে উভয় ভাষায় মূলত দুটিমাত্র সংকলিত গ্রন্থের (ঠাকুরমার ঝুলি, বুঢ়ী আইব সাধু) আলোচনামূলক পদ্ধতির রীতি অনুসারে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হবে। তবে বাংলায় শুধুমাত্র 'ঠাকুরমার ঝুলি' কিন্তু অসমীয়ায় লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার আরও দু একটি গ্রন্থও আলোচনা প্রসঙ্গক্রমে এসেছে। গ্রন্থ দুটির সমান্তরাল আলোচনায় দেখা যায় যে ভিন্নভাষা ও দেশরীতি নীতি আচার আচরণের ভিন্নতা সত্ত্বেও আশ্চর্য সাদৃশ্য। গজেন্দ্রকুমার মিত্র দক্ষিণা রঞ্জন রচনা সমগ্রের ভূমিকা লিখতে গিয়ে লিখেছেন—

"একই ধরনের রূপকথা বিভিন্ন দেশের আবহাওয়া বিভিন্নরূপ নিয়েছে—কাঠামোর উপরের মাটির প্রলেপ, রঙের টান ও সোলার কাজটা আলাদা।"[৫] এই 'আলাদা'টাই সেই সেই দেশের বৈশিষ্ট্য। সাদৃশ্য দেখে কখনই এটা ভাবা যায় না যে একজন অন্যজনের অনুকরণ করেছেন। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া ও 'রুঢ়ী আইৰ সাধু'র 'পাতনি' (ভূমিকা) তে লিখেছেন—

"পাঠক সকলে দেখিব যে এই কিতাপতদিয়া কোনো কোনো টো সাধু ভারতবর্ষব আনদেশত, ঘাইকৈ বঙ্গদেশত প্রচলিত সাধুৰে সৈতে ঘাই কথাবিলাকত মিলে। এনে দেখি যতি তেওঁলোকে ভাবে যে সেইবোৰ বিদেশী সাধুৰ ছাঁলৈ ৰচনা কৰা হৈছে তেন্তে ভুল হব।" [৬] (পাঠকেরা দেখবেন যে এই গ্রন্থের কোনো কোনো লোক কথার গল্প ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশে বিশেষ করে বঙ্গদেশে প্রচলিত লোককথার সঙ্গে মূলকথা গুলো মিলে যায়। এটা দেখে যদি তারা ভাবেন যে ওগুলো বিদেশী লোক কথা ছায়া অনুসরণে রচিত তা হলে তাদের ভুল হবে।) তাই মুখে মুখে চলে আসা এই সব লোক কথারা কোথাও এসে মিলে যায়, আবার কোথাও আলাদা হয়ে যায়।

এখন উভয় ভাষার দুটো লোককথায় বিশ্লেষণ করে সাদৃশ্যের স্বরূপটি দেখা যেতে পারে। 'ঠাকুরমার ঝুলির' কলাবতী রাজকন্যা'র গল্পটিই ধরা যাক। রাজার সাত রানী

এবং সবাই নিঃসন্তান। সন্ন্যাসীর ওষুধে সবাই গর্ভবতী হয়। কিন্তু বড় রানীদের চক্রান্তে ছোটদুই রানী ওষুধ পরিমানে কম পায়। ফল স্বরূপ তাদের গর্ভে বানর ও পেঁচার জন্ম হয়। শেষে নানা বাধা বিপত্তি, সাগর মহাসাগর পেরিয়ে ঘটনা রূপকথার প্রশান্তিতে শেষ হয়। অনুরূপভাবে আমরা স্মরণ করতে পারি লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার 'বেটুকোঁৰৰ' (খর্বকায়) গল্পটির কথা। এখানে রাজার সাত রানী, তারা নিঃসন্তান এবং যথারীতি ছোটরানী অবহেলিত। বেশিরভাগ রূপকথার গল্পেই আমরা দেখতে পাই যে ছোটরানীরা অবহেলিত। একাধিক পত্নীর মাঝে সম্ভবতঃ রানীরা সবশেষে আসা কনিষ্ঠা সপত্নীকে সহ্য করতে পারত না। আর রাজাদেরও হয়তো অল্প বয়সী এই রানীর প্রতি দুর্বলতা থাকত বেশি। সব মিলিয়ে সে নির্যাতনের শিকার হতো। 'এদের সঙ্গেই মিশে যায় বাংলার নারী..... ঠাকুরমার ঝুলি উপচে পড়ে নারীর দুঃখ কথা। রূপকথার বুকের ভেতর জন্ম হয় নারীর দুঃখ কথা, জননী যন্ত্রণা। সময় বদলে গেলেও নারীর কষ্ট বদলায় না, শুধু মোড়ক বদলে যায়।" [৭] এখানে মনে হয় শুধু বাংলার নারী নয়, অসমের ও লোক-কথার নারী একই যন্ত্রণার শরীক। শুধু 'মোড়ক' বদলায়। তাই বেজরুবুয়ার ছোট রানীও সন্ন্যাসীর দেওয়া ওষুধের যথোচিত ভাগটা পায় না, পায় ছিটে ফোঁটা, জন্মদেয় 'বেটু কোঁবৰের' (খর্বকায়) 'সোনাৰ গছ বূপৰপাত' রাজার অন্য পুত্রেরা আনতে পারে না। নানা দেশ এবং বাধা বিপত্তি পেরিয়ে এই বেটুকুমারই তা রাজাকে এনে দেয়, যেমন দিয়েছিল 'কলাবতী রাজন্যা'র বুদ্ধভুতুম। সুড়ঙ্গ, পাতালপুরী, রাজকন্যা, সোনা, রূপা, হীরার চমক সব মিলিয়ে দুটি গল্পকেই খুব কাছাকাছি বলে মনে হয়। 'এক যে রাজা' (কলাবতী রাজকন্যা) রূপকথার এই কথনভঙ্গী উভয় ভাষাতেই এক। গল্পের আরম্ভ একই ধরনের 'এ জন ৰজা আছিল ( এক যে রাজা ছিল) বেটু কোঁৰব)

রূপকথার গল্পে বাঘ, কুমীর, বেড়াল, সাপ, ব্যাঙ, হাতী, শেয়াল নানারকম পশু বা পাখী গল্পে এক একটি চরিত্র হয়ে ওঠে। এর মধ্যে শেয়ালের ধূর্ততা নিয়ে গল্পের শেষ নেই। 'ঠাকুরমার ঝুলির 'শেয়াল পণ্ডিতের পাশাপাশি, বুঢ়ী আইৰ সাধু'তে ও শেয়ালকে নিয়ে অনেক গল্প— বরং 'ঠাকুরমার ঝুলির থেকে বেজবরুয়ার সংকলনে শেয়ালকে নিয়ে গল্পের সংখ্যা অনেক বেশি। 'বুঢ়ী আইৰ সাধু'র 'বান্দৰ আৰু শেয়াল', (বাঁদর ও শেয়াল) 'বুধিয়ক শেয়াল' (বুদ্ধিমান শেয়াল), বুড়া-বুঢ়ী আৰু শেয়াল' (বুড়ো বুড়ী এবং শেয়াল। উভয় দেশের গল্পেই ধরা পড়েছে শেয়ালের ধূর্ততা, অন্যের নাস্তানাবুদ হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত শেয়াল তার কাজের জন্য শাস্তি পেয়েছে। 'ঠাকুরমার ঝুলি তে শেয়াল কুমীরকে বোকা বানিয়েছে, যদিও শেষে নিস্তার পায়নি। 'বুধিয়ক শেয়াল'-এ শেয়াল বাঘকে বোকা বানিয়েছে এবং এখানেও শেষ পর্যন্ত সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। উভয় ভাষার লেখাতেই যে নীতিবাক্যটি ধরা পড়েছে তা হল— অতি চালাকির ফল মৃত্যু। অনেক দেশের রূপকথাতেই শেষে একটা নীতিবাক্য থাকে যা এই দুই ভাষাতেও লক্ষ্য করা যায়।

ঠাকুরমার ঝুলির 'ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী' আর 'ককা-দেউতা আবু নাতি লবা'র 'বামুন আবু বামনী' (ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণী) গল্পের নামকরণ পর্যন্ত সাদৃশ্যযুক্ত। গল্পের বিষয়বস্তুও প্রায় একই ধরনের। উভয় গল্পেই ব্রাহ্মণ বোকা আর ব্রাহ্মণী চতুর। ব্রাহ্মণ ভুল করে



যা বলে কাকতালীয় ভাবে তাই-ই সত্য হয়ে দাঁড়ায়। উভয় চরিত্রেরই গণৎকার আর গণনায় ভুল বলেও তাদের প্রাপ্তিতে কোনো অসুবিধে হয় না। ছড়ার আকারে উভয়েই যে কথা বলে ঘটনাচক্রের তাই সত্য হয়ে দাঁড়ায়। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী গল্পে ধোপার গাধা খোঁজা থেকে শুরু করে রাজার মেয়ের গলার হার খোঁজা সবই এক ভুলে ভরা অধ্যায়। রাজার ভয়ে ব্রাহ্মণ জগদম্বাকে ডাকতে গিয়ে জগামালিনীর সন্ধান পায়—

"তখন বুঝিলা ব্রাহ্মণ, কি করে কি হল—
জগদম্বা নাম নিতে জগা ধরা দিল!" [৮]

অন্যদিকে 'বামুণ আবু বামনী'তে সিঁধ কাটতে এসে বামুনের ভুল শ্লোক চোরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। শ্লোকটি হল

"খুচুব-খুচুব মাটি খোচৰাঃ
কুচুটি-মুচুটি
বহি কিং কৰাঃ
এ খুজি দুখুজিকৈ ক'লৈ যোৱা ঃ।" [৯]

(খুচুর মুচুর করে মাটি খুঁচিয়ে কুচিমুচি হয়ে বসে কি করছ। এক পা দু'পা করে কোথায় যাও।) উভয় ক্ষেত্রেই গল্পের শেষে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী সুখে দিন যাপন করে।

এবার অসম ও বাংলা দু-দেশের বিখ্যাত দুটি রূপকথা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। বাংলার যেমন লোকমুখে প্রচলিত 'সাত ভাই চম্পা' অসমেও বিভিন্ন গল্প, প্রবাদ, লোক কথায় মুখে মুখে প্রচলিত তেজীমালার রূপকথা। বড় রানীদের চক্রান্তে ছোটরানীর সাত ছেলে আর এক মেয়ে চম্পা আর পারুল ফুল গাছে রূপান্তরিত হয়েছে'সাত ভাই চম্পা'য়। 'তেজীমলা'তেও মাতৃহীন তেজীমলা মাসীর চক্রান্তে কখন ও লাউগাছ, কখন ও লেবু গাছ আবার কখন ও পদ্মফুলে রূপান্তরিত হয়। রাজা যখন ফুল তুলতে যান চাঁপারা বলে ওঠে—

"না দিব, না দিব ফুল, উঠিব শতেক দূর,
আগে আসুক রাজার বড় রানী,
তবে দিব ফুল।" [১০]

'তেজীমলা'তেও তেজীমলা বৃদ্ধা, রাখাল বালক কাউকে লাউ বা লেবু ছিঁড়তে দেয়নি। শেষপর্যন্ত পিতাকে তেজীমলা নিজের পরিচয় দিয়েছে—

"হাতো নেমেলিবা, ফুলো নিছিঙিবা, চেনেহৰ পিতাদেউ এ।
পাঠ-কাপোৰৰ লগতে মাহী আই খুন্দিলে, তেজীমলাহে মই।।" [১১]
("হাতদিয়োনা, ফুল ছিঁড়োনা, বাবা তোমার স্নেহবালা।
পাট-কাপড়ের অজুহাতে মারল মাসী, আমি যে তেজীমলা।" )[১২]

উভয় গল্পেই দোষীরা শাস্তি পেয়েছে এবং গাছ থেকে আবার তারা মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলা এবং অসম দু-দেশেই এই সাত ভাই চম্পা এবং তেজীমলাকে নিয়ে অনেক গীত কথা রচিত হয়েছে।

উভয় দেশের লোক কথাতেই গদ্যের পাশাপাশি কাব্যিক পংক্তি, প্রবচন, ছড়ার ব্যবহার ও লক্ষ্য করা যায়। ছড়া ব্যবহারের ভঙ্গিমার সাদৃশ্যটি লক্ষমীয়। 'ঠাকুরমার ঝুলির' 'ফুরাল' অংশটির সঙ্গে 'বুঢ়ী আইৰ সাধু'র 'এজনী মালিনী আৰু এ জোপা ফুল'

লেখাটির সাদৃশ্য লক্ষণীয়—

**ফুরাল**

আমার কথাটি ফুরাল
নটে গাছটি মুড়াল
"কেনরে নটে মুড়ালি?"
"গরুতে কেন খায়?
"কেনরে গরু খাস?"
"রাখাল কেন চরাস না?"
"কেনরে রাখাল চরাস না?"
বৌ কেন ভাত দেয়না? [১৩]

**এজনী মালিনী আৰ এজোপা ফুল**

মালিনী-'অ, গৰু, অ'গৰু,
ফুলগছৰ আগ খাৰ কিয়?
গৰু— "গৰখীয়াই যে গৰু
নাৰাখে, মই বা নাখাম কিয়"
মালিনী— "অ' গৰখীয়া, অ'
গৰখীয়া, গৰু নাৰাখ কিয়?"
গৰখীয়া— "বান্ধনীয়ে যে ভাত নিদিয়ে
মই বা ৰাখিম কিয়? "[৪]

**বাংলা অনুবাদ**

[মালিনী— ও গরু ও গরু ফুলগাছের ডগা খাস কেন?
গরু— রাখাল যে গরু রাখে না, খাব না কেন?
মালিনী— ও রাখাল, ও রাখাল গরু রাখিস না কেন?
রাখাল— রাঁধুনি যে ভাত দেয় না, আমি বা রাখব কেন?]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ওড়িয়া লোক কথায় ও এই ধরনের ছড়ার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়—

আমার কথাটি ফুরোল
ফুলগাছটি মুড়োল
অ ফুলগাছ! মুড়োলি কেন?
কালো গাই যে খায়!
অ কালো গাই কেন খাস?
রাখাল কেন চরায় না?
অ রাখাল কালো গাই চরাস না কেন
বেটার বৌ কেন ভাত দেয় না .....[১৫]

রূপকথার গল্পে ভাষা কোনো সমস্যাই নয়, তাই গাছ, মানুষ, গরু সবাই সবার কথা বুঝতে পারে। তাই বিভিন্ন ভাষার রূপকথার এই বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। গল্পের মাঝে মাঝে ও ছড়ার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। লালকমল নীলকমল, ডালিমকুমারের মতো 'তুলা আৰু তেজা' (তুলা এবং তেজা) ঢোবাকাউৰী আৰু 'টিপাচীচরাই' প্রভৃতি গল্পেও অজস্র ছড়ার সমাহার। এই ছড়া কখনও মানুষ বলে, কখনও গাছ বলে আবার কখনও বা পাখি বলে।



ঠাকুরমার ঝুলির 'শীতবসন্ত' গল্পে টিয়া পাখি বলে—

"রাজকন্যার রূপবতী নাম থুয়েছে মায়।
গজমোতি হত শোভা ষোল কলায়।
না আনিল গজমোতি, কেমন এল বর?
রাজকন্যা রূপবতীর ছাইয়ের সয়ম্বর"। [১৬]

'তুলা আৰু তেজা' গল্পে ময়না পাখি বলে ওঠে—

"ডালিম পকি সৰি গল।
তেজা বাই গাভৰ হ'ল।
তেওঁ ৰজাৰ মনত ন হল।" [১৭]
[ ডালিম পেকে পড়ে গেল
তেজা দিদি যুবতী হল
তবু ও রাজার মনে না পড়ল ] [১৮]

উভয় ক্ষেত্রেই ছড়ার আকারে পাখিরা বিস্মৃত ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

উভয় দেশের লোক কথায় সাদৃশ্যের পাশাপাশি স্বাতন্ত্র্যও বর্তমান। 'ঠাকুমার ঝুলি'তে যেমন বঙ্গদেশকে চেনা যায় 'বুঢ়ী আইৰ সাধু'তে তেমনি অসমের লোক জীবনের এক চিত্র ফুটে ওঠে। বঙ্গদেশের বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে ঠাকুমা দিদিমারা খুব স্বাভাবিক ও সঙ্গতভাবেই তারা তাদের জায়গা করে নিয়েছিল। অরুণ-বরুণ কিরণমালার মা, বুদ্ধভুতুমের দুঃখিনী মায়েরা বঙ্গদেশের দুঃখিনী বধূদের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। তাই "রূপকথার" ভেতরেই কখন মিলে মিশে যায় বাংলার সবংসহা নারী।"[১৯] ঠাকুরমার ঝুলির পাতায় পাতায় বাংলাদেশের এই দুঃখিনী মায়েরা ছড়িয়ে আছে।

অনুরূপভাবে 'বুঢ়ী আইৰ সাধু'র মধ্যেও অসমের লোকজীবন, লোকাচার বা লোক বিশ্বাসের প্রকাশ। যেমন— 'কটা যোৰা নাক খাৰনী দি ঢাক (কাটা যাওয়া নাক, ফেন দিয়ে ঢাক) গল্পে এসেছে অসমের বিখ্যাত বিহু উৎসবের কথা, বিহু উৎসবের পূর্বদিন 'উরুকা'র কথা। বহাগ বিহু বা রঙালী বিহুতে মেয়েরা নিজেদের প্রিয় মানুষষকে, গুরুজনকে নিজের হাতে তাঁতে বোনা 'ফুলাম গামোচা' তুলে দেয়, আর বিহুর আগে চলে তার বিরাট প্রস্তুতি। আত্মীয় স্বজন পরস্পরের কুশল বিনিময় ও তাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করা ও রক্ষা করা এ সবই বিহু উৎসবের অঙ্গ আর এই গল্পের মধ্যেও এসেছে সে সব প্রসঙ্গ। তাঁতে কাপড় বোনা অসমীয়া মেয়েদের একটি বিশিষ্ট গুণ। "আজিব বাজে কাইলে বহাগ বিহু। বৰ বিহুৰ দিনা গা পা ধুই আহি চোতালত থিয় হোৰা নিজৰ লৰা ছোৱালীক আৰু গিৰিয়েকক অতি কমে ও এডুখৰি নিজে বোরা ন-কাপোৰ সিহঁতে নিদিলেই নহয়, মিনতৰ কুটুম লা-লগুৰাৰতো কথাই নাই।"[২০] [আজ বাদে কাল বহাগবিহু। বরবিহুর (অর্থাৎ বৈশাখ মাসের বিহু) দিন স্নান করে আঙ্গিনায় দাঁড়ানো ছেলে মেয়েদের এবং স্বামীকে অন্তত হাতে বোনা একটা করে নতুন কাপড় নাদিলেই নয়। তাছাড়া আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের তো কথাই নেই।] 'তুলা আৰু তেজা' গল্পেও এসেছে সেই কাপড় বোনার প্রসঙ্গ। 'তেজীমলা' গল্পে এসেছে অসমীয়া মেয়েদের পোষাক রিহা ও মেখলার কথা।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ্য যে 'ঠাকুমার ঝুলি'র তুলনায় 'বুঢ়ী আইৰ সাধু'তে দেশজ জীবনযাত্রা, পোষাক পরিচ্ছদ, আচার অনুষ্ঠান বেশি স্পষ্টকারে প্রকাশিত।

ভারতে লোক মুখে প্রচলিত একটি গল্পে আছে যে এক দার্শনিকের সঙ্গে এক

ছুতোরের দেখা হলে দার্শনিক ছুতোরের ছুরিটি দেখে জানতে চায় যে এটি কতটা পুরানো। উত্তরে ছুতোরটি জানায় যে এটি বহু পুরুষ ধরে তাদের বাড়িতে আছে। যদিও বহুবার এটির হাতল ফলা বদলানো হয়েছে কিন্তু ছুরিটিতো ছুরি-ই আছে। লোককথাও অনুরূপ। বিভিন্ন দেশে কালে, বিভিন্ন কথকের মুখে তার নানা পরিবর্তন ঘটলে ও গল্পের মূল আদলটি একই থেকে যায়। তাই শ্রুতিবাহিত এই লোককথা এক ভাষার সঙ্গে আরেকভাষার সাদৃশ্যযুক্ত সম্পর্কে ধরা পড়ে।

**তথ্যসূচী**


১. বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর— 'কড়ি ও কোমল' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সঞ্চয়িতা পৃ. ৪৬
২. অসমীয়া সাহিত্যর রূপরেখা— মহেশ্বর নেওগ। পৃ. ৩০
৩. গ্রন্থকারের নিবেদন— ঠাকুরমার ঝুলি, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। পৃ. ১৫/১৬
৪. 'পাৰানব কাহিনীৰ বাহিৰে ও ককাই আমাক বজা, প্রজা, ভূত প্রেত আদিৰ সাধু ও কৈ আমোদ আৰু ভয় প্রদান করিছিল।' [পুরাণের কাহিনী ছাড়াও দাদু আমাদেরকে রাজা, প্রজা, ভূত প্রেত ইত্যাদির রূপকথা বলে আমোদ আর ভয় পাইয়েদিতেন] মোবৰ জীবন শোঁৱৰণ— প্রথম ভাগ, প্রথম আধ্যা লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, পৃ. ৭
৫. ভূমিকা— দক্ষিণারঞ্জন রচনা সমগ্র— গজেন্দ্র কুমার মিত্র
৬. পাতনি— বুঢ়ী আইৰ সাধু— লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া
৭. বর্তমান, রবিবার ১২ই নভেম্বর ও ২০০৬— জয়ন্ত দে
৮. ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী— ঠাকুরমার ঝুলি, দক্ষিণারঞ্জন রচনা সমগ্র। পৃ. ১২৭
৯. বামুণ আৰু বামনী— ককাদেউতা আৰু নাতি লৰা— লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুয়া, বেজবরুয়া গ্রন্থাবলী— ১ম খণ্ড পৃ. ৮০১
১০. সাত ভাই চম্পা— ঠাকুরমার ঝুলি, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন রচনা সমগ্র পৃ. ২৯
১১. তেজীমলা— বুঢ়ী আইৰ সাধু-লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া পৃ.২৯
১২. বুঢ়ী আইৰ সাধুর বাংলা অনুবাদ— বুড়িমার বুলি— অনুবাদক শক্তিময় দাশ পৃ. ২৫
১৩. ফুরাল— ঠাকুরমার ঝুলি— দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন রচনা সমগ্র। পৃ. ১৪২
১৪. এজনী মালিনী আৰু এজোপা ফুল— বুঢ়ী আইব সাধু— লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া পৃ. ১১৩
১৫. আমার কথাটি ফুরোল— ওড়িয়া— ভারতের লোক কথা সঙ্কলন ও সম্পাদনা— এ.কে. রামানুজন, অনুবাদ— মহাশ্বেতা দেবী পৃ. ২৯৫
১৬. শীত বসন্ত— ঠাকুরমার ঝুলি— দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন রচনা সমগ্র। পৃ. ৪১
১৭. তুলা আৰু দেজা— বুঢ়ী আইৰ সাধু— লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া পৃ. ৫৮
১৮. বুঢ়ী আইৰ সাধুর বাংলা অনুবাদ বুড়িমার বুলি— অনুবাদক শক্তিময় দাশ, পৃ. ১১৫
১৯. বর্তমান, রবিবার ১২ নভেম্বর ২০০৬, জয়ন্ত দে।
২০. কটা যোৱা নাক খাৰণী দি ঢাক— বুঢ়ী আইৰ সাধু— লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া— পৃ. ৬৪




# অসমের দ্বিভাষিক বাংলা ভাষায় অসমিয়া প্রভাব

সঞ্জয় দে

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বাঙালিদের প্রবাসী অবস্থান এবং অসমের একটি অংশে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের বিস্তার—এ দুয়ের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক পার্থক্য রয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বাঙালিদের বসতিস্থাপন ও বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গঠনের মূলে ছিল তাঁদের জীবিকা সূত্রে প্রব্রাজন। অথচ অসমে বাঙালিদের উপস্থিতি কেবলমাত্র জীবিকার অন্বেষণে আসা নিছক ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফলশ্রুতি নয়। বরং তা আসলে এক রাষ্ট্রনৈতিক কূটকৌশলের পরিণাম। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রধানত ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হলেও এক বিস্তীর্ণ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলকে অসমের রাজ্যসীমার অন্তর্ভুক্ত করার পিছনে ছিল ঔপনিবেশিক শাসননীতির আর্থরাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং তার ফলস্বরূপ অঞ্চল ভাগবাটোয়ারার ইতিহাস। বাঙালি অধ্যুষিত যে অঞ্চল বর্তমানে অসমের অন্তর্গত তা আসলে মোটামুটিভাবে দুটি পৃথক রাজনৈতিক খণ্ডের সমষ্টি—১) শ্রীহট্ট ও ২) কাছাড়। পূর্ববঙ্গের অংশ শ্রীহট্টে বাংলা ভাষাই প্রচলিত ছিল। ব্রিটিশ উপনিবেশভুক্তির আগে কাছাড় ছিল ডিমাসা রাজাদের শাসনাধীন। সুরদর্প নারায়ণের সময় থেকেই সে রাজ্যেরও সর্বস্তরে বাংলা ভাষাই প্রচলিত ছিল। ১৭৫৭-তে ক্লাইভের পলাশীর যুদ্ধ জয়ের ফল হিসেবে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দেওয়ানি লাভ করলে শ্রীহট্টে কোম্পানির শাসন চালু হয় ১৭৬৫-তে। আর ১৮৩০-এ গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী না থাকার অজুহাতে কাছাড় ব্রিটিশের রাজ্যভুক্ত হয় ১৮৩২-এ। টোমাস ফিশারকে সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত করে কাছাড়কে ঢাকা কমিশনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

অতঃপর ১৮৭৪-এ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও প্রতিবেশী পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে অসম প্রদেশ গঠনের সময় ঔপনিবেশিক শাসক আর্থ-রাজনৈতিক কারণে সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া অঞ্চলকে এই নবগঠিত প্রদেশের সঙ্গে জুড়ে দেন। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গের আগে এই বঙ্গ-বিভাজনই ছিল প্রথম বঙ্গবিচ্ছেদ। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠার ফলে ১৯১৩-তে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়, কিন্তু গোয়ালপাড়া সহ শ্রীহট্ট ও কাছাড়কে আগের মতো অসমের সঙ্গেই জুড়ে রাখা হয়। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা লাভের আবশ্যিক শর্ত হিসেবে দেশভাগ ছিল অনিবার্য। দেশভাগের ফলে আবার খণ্ডিত হল শ্রীহট্ট। গণভোটের সিদ্ধান্তমর্মে শ্রীহট্ট পাকিস্তানের অর্ন্তভুক্ত হয়। কিন্তু সীমানা নির্দেশের সময় র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুসারে

দে, সঞ্জয় : অসমের দ্বিভাষিক বাংলা ভাষায় অসমিয়া প্রভাব
*International Journal of Bengal Studies, Vol. : 2-3, 2011-2012, PP 183-194*